আল্লাহর অস্তিত্ব ও আধুনিক বিজ্ঞান

আবিষ্কার-উদ্ভাবন আবিষ্কারক-উদ্ভাবক এর অস্তিত্বের সত্যতা বিষয়ে ধারণা দেয়, বিশ্বাস জন্মায়। কোনো ঘটনা তার সংঘটকের-সম্পাদকের অস্তিত্বের প্রতি নির্দেশ করে শতসিদ্ধভাবে। সরল প্রকৃতিনির্ভর যুক্তিবাদ বলা যেতে পারে উল্লিখিত ধরনের প্রমাণপ্রক্রিয়াকে। আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ কী? প্রাচীন আরবের জনৈক বেদুইন এ-প্রশ্নের উত্তর খোঁজেছেন এ-ধরনের প্রকৃতিনির্ভর যুক্তিবাদের সারল্যে। তিনি বললেন , উটের বর্জ্য উটের অস্তিত্বের প্রমাণ। গাধার বর্জ্য গাধার অস্তিত্বের দলিল। পদচিহ্ন, হেঁটে যাওয়ার প্রমাণ। অতঃপর, কক্ষপথসম্পন্ন আকাশ, পথঘাটবিশিষ্ট জমিন, তরঙ্গসর্বস্ব সাগর প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ না হওয়ার কোনো কারণ নেই । (দ্রঃ আস সায়াদাহ আল আবাদিয়াহ ফিশ শারিয়াহ আল ইসলামিয়াহ : ৪২)

বোধ যাদের স্বচ্ছ, বুদ্ধি যাদের উন্মুক্ত, প্রকৃতিনির্ভর এ-প্রমাণটি তাদের কাছে স্পষ্ট -অকাট্য। তবে দর্শনের পাঁক সৃষ্টিতে যারা অভ্যস্ত এ- প্রমাণ তাদের পরীক্ষায় অপর্যাপ্ত। তাদের বক্তব্য , এ-প্রমাণটি প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। তার মানে কিছু আলামত- ইঙ্গিতের নির্ভরতায় ধরে নেয়া হয়েছে — স্রষ্টার অস্তিত্বের একটা বাস্তবতা আছে।

এ-প্রশ্নটি খুবই জোরালো মনে হতো আগেকার যুগে। কেননা মহাবিশ্ব, মানুষের জ্ঞানের-উপলব্ধির বলয়ে, সরাসরি ও প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সীমানায় আসার মতো একটি বিষয় বলে ধারণা করা হতো। প্রাচীন ধারণা মতে প্রতিটি জিনিসের সর্বশেষ বিশ্লিষ্ট রূপের একক হলো পরমাণু -এটম। এমনকি নিউটনের কাছেও —আলো— ছোট ছোট পরমাণুর সমন্বয়ের নাম ছিল যা আলোকিত বস্তু থেকে বের হয়ে শূন্যে ছড়িয়ে যেতো। এ-তত্ত্বটিকে carpuscles theory of light বলে ডাকা হয়েছে।

যতদিন মানুষের অধ্যয়ন ও গবেষণার পদচারণা Microcosmic level – এ সীমিত ছিল ততদিন এ-তত্ত্বও চলেছে বীরদর্পে । কিন্তু, যেই মানুষের জ্ঞান এই ভাসমান স্তর অতিক্রম করে অতিক্ষুদ্র মহাজাগতিক স্তরে (Macrocosmic level) প্রবেশ করার অধিকার পেল অমনি উলটপালট হয়ে গেল সবকিছুই। যে পরমাণুকে মনে করা হতো অখন্ড, ভাঙ্গন-বিরোধী সেই পরমাণু ভেঙ্গে খন্ডিত হয়ে চমক দেখাল সবাইকে। তার জায়গা দখল করল এমনসব তরঙ্গমালা (waves) যা না আসে প্রত্যক্ষের আওতায় না অনুগত হয় কোন মাপযন্ত্রের। মানুষের জ্ঞানের এ-পরিবর্তন বিংশ শতাব্দীর প্রথম কোয়ার্টারেই সৃষ্টি হয়। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই যুক্তি অথবা প্রমাণ-প্রক্রিয়ার মূলনীতিতেও ঘটে পরিবর্তন ।

মহাবিশ্বের কোন কিছুরই সর্বশেষ প্রকৃতি সরাসরি জানা যায় না, এ-বিষয়টি এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। কোন জিনিসের প্রভাব বা ফলাফল (effects) দেখে ওই জিনিসটির অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে বলে বিশ্বাস করে নেয়া, এতটুকুই শুধু মানুষের পক্ষে সম্ভব। আর এভাবেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা সরাসরি-যুক্তি-প্রক্রিয়ার যে ধারণা ইতোপূর্বে বদ্ধমূল ছিল , চিড় ধরল তার শক্ত দেয়ালে। বিজ্ঞানের স্বীকৃত বলয়েও মেনে নেয়া হলো, পরোক্ষ প্রমাণও একটি আইনসিদ্ধ- বৈধ-বৈজ্ঞানিক প্রমাণ।

তিনশ বছর পূর্বে মনে করা হতো- প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ এ-দুপ্রকার প্রমাণের যেকোন একটিকে বেছে নেয়া ব্যতীত অন্যকোনো সুযোগ নেই আমাদের হাতে । প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই, তাই , কেবল বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে বহু কাল। পরে জানা গেল ব্যাপারটা আসলে সে রকম নয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অথবা অপ্রমাণ এ-দুয়ের মাঝে একটিকে বেছে নেয়া ছাড়া অন্যকোন সুযোগই নেই, এ-ধারণা বিজ্ঞানের জগতে এখন আর প্রবাহিত নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের যুক্তিপ্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতার বলয়ে, পরোক্ষ প্রমাণ যুক্তিসিদ্ধ- বৈধ, এ-কথায় বিশ্বাস করাই হলো, বর্তমানে, বিজ্ঞানমনস্কতার আলামত।

আধুনিকযুগে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলতে যা বুঝায়-যার ওপর তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের গোটা সৌধ দাঁড়িয়ে -তার পুরোটাই প্রতিষ্ঠিত পরোক্ষ প্রমাণের ভিতে।

এই নতুন বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের আলোকে উল্লিখিত আরব-বেদুইনের প্রদত্ত যুক্তি পরীক্ষা করে দেখলে বিজ্ঞানের দাঁড়িপাল্লায় শতভাগ যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ বলে মনে হবে। বিজ্ঞান প্রকৌশল ও যুক্তির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এসেছে

তা উল্লিখিত ধরনের সরল-সহজ প্রমাণকে বৈজ্ঞানিক প্রমাণে রূপান্তরিত করে দিয়েছে। বর্তমানে এ-দুয়ের মাঝে আর পার্থক্য থাকেনি।

পুরাতন বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার বলয়ে অসরাসরি হওয়াটাই পরোক্ষ প্রমাণের ত্রুটি হিসেবে মনে করা হতো। কিন্তু বর্তমানে খোদ বিজ্ঞানের কাছে বৈজ্ঞানিক ধারণা পেশ করার এটাই হলো যৌক্তিক বুনিয়াদ। মূলনীতির দৃষ্টিতে আধুনিক বিজ্ঞানের সকল যুক্তি, -এ-যাবৎ যাকে ধর্মীয় যুক্তি বলে ডাকা হয়েছে - তারই অনুরূপ।

ধর্মীয় যুক্তির বুনিয়াদ মহাবৈশ্বয়িক প্রকৃতির সারল্যে অবস্থিত। অর্থাৎ মানুষ তার অধিকারে থাকা যোগ্যতা-শক্তি-মেধা -র সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটিয়ে যতদূর পৌঁছুতে পারে অথবা বর্তমান মহা-বিশ্ব যুক্তির সীমানা যতটুকু টেনে নিতে অনুমতি দেয়, ধর্ম এর সবটাই অবলম্বন করে আছে প্রথম দিন থেকেই। তবে বিগত শতাব্দীগুলোতে বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ হিসেবে যাদের উত্থান ঘটেছে এ-বাস্তবতাটি না বুঝে তারা এমন জমিনের ওপর দাঁড়াতে চেয়েছেন যার অস্তিত্ব বলতে কিছু নেই। ফলে ধর্ম তার বিশালতা ঠিকই বজায় রাখলো, পক্ষান্তরে মানুষের দাবি ঘুমুতে গেল ইতিহাসের আর্কাইভে। আধুনিক ইতিহাসের এ-ঘটনা মনুষ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনায় ধর্মীয় বা ওহী নির্ভর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবিনাশী অবস্থাকে নির্দেশ করছে। ধর্মীয় জ্ঞানের সত্যতাকে সর্বোচ্চ মানদণ্ডের আলোকে করে দিচ্ছে প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত।

mgvß